ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পের জ্যোতিরিন্দ্র : বোধের মূল্যায়ণে রাজনীতি, মধ্যবিত্ত ও মনুষ্যত্ব

মহাশ্বেতা দেবী তাঁকে একসময় বলেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যের যুক্তফ্রন্টের নির্দলীয় প্রতিনিধি'। বস্তুতঃই চল্লিশের দশকের যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা আর রাজনৈতিক টানাপড়েন, দেশভাগের পরিণামস্বরূপ পূর্ববাংলা থেকে আগত অগণ্য উদ্বাস্তুর চাপ যে ধ্বস্ত সমাজের অনিবার্য প্রতিক্রিয়াকে সৃষ্টি করেছিল তাকেই গল্পে-উপন্যাসে বহুকৌণিক ডাইমেনশনে তুলে ধরেছিলেন সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সমকালীন কথাসাহিত্যিকেরা। কালোবাজার, চোরাচালান, সামাজিক অবক্ষয়, বেকারী, দারিদ্র ছিল এ সময়ের গল্প-উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। যুদ্ধের দামামা, বারুদের গন্ধ, ফ্যানের গন্ধ, মারী-মড়কের চির পরিচিত দৃশ্য আর অসহায় রক্তের দাগের ওপর দিয়ে যেন হেঁটে চলেছিলেন এসময়ের শিল্পী লেখক গোষ্ঠী। আর এঁদের মধ্যে থেকেই যেন সর্বার্থে নিজেকে আলাদা গোত্রের লেখক বলে চিহ্নিত করলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২)। সবার মাঝে থেকেও তিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল অথচ একলা। সমালোচকদের একাংশ এখনও যাঁর গল্পে খুঁজে পান শুধুই 'মর্বিডিটি'। নিজেকে যিনি 'অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী'[১] বলে স্বীকার করে নেন এবং বলতে থাকেন 'এটা তো ডেকাডেন্স, অবক্ষয়েরই যুগ'[২] তখন তিনি চল্লিশের দশকের অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত জীবনের এক সার্থক রূপকার বলে গণ্য হলেও এই নিজস্বতা অথবা স্বকীয় সৃষ্টির অনন্যতাই যেন বলতে চায় পঞ্চাশ বছর ধরে লিখেও কোনো বিশেষ সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠতে পারেন নি তিনি, পাননি পর্যাপ্ত প্রচার, পুরস্কার অথবা জনপ্রিয়তার কোনটাই। অথচ মানিকের মতোই ইয়ুং বা ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্বর অনুসন্ধানে তাঁর গল্পে উপন্যাসে ধরা পড়ে এক অনন্যতা—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনা। কখনও কলকাতার নাগরিক সমাজ থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা আবার কখনও বা 'যতটা না ন্যাচারালিস্ট তার চেয়ে অনেক বেশী ইস্‌থেটিক'[৩] বলে মনে হয় তাঁকে। সমসাময়িক সুহৃদ লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখকসত্তার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন এবং সেগুলি হলো 'অপূর্ব চরিত্র চিত্রণ', 'অনবদ্য বিশ্লেষণ' এবং 'অন্তর্মুখী ভাষা' (অমৃত : চিঠিপত্র বিভাগ, ২২/১০/৭৬)। গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র যেন একালের নাগরিক ঔপনিবেশিক বাস্তবতার (urban colonialism) সঙ্গে প্রকৃতির একটা দ্বন্দ্বকেই প্রতীকায়িত করতে চান তাঁর গল্পে। উপনিবেশোত্তর কলকাতার নাগরিক সমাজের অবক্ষয়িত অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক চেহারার স্বরূপ মূল্যায়ণে অমোঘ চিহ্নক হিসাবে প্রায় সর্বত্রই উঠে আসে যৌনতা এবং ডি.এইচ.লরেন্স সুলভ যৌনতার নিরিখেই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সমস্ত জটিলতা ও মানবিক নির্যাসকে খুঁজে পেতে চান তিনি। তবু সংঘাত নয়, কোথাও যেন একটা আপোষ

রক্ষা করে চলার অবদমিত চেষ্টা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তাঁর লেখক সত্তায়। যে কারণে তিনি বলেন : ''শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো, অন্য কিছু নয়। প্রতিবাদ বা স্লোগান নয়। কারণ, আমার মতে সেটা শিল্পসঙ্গত হবেনা। সচেতন শিল্পীর কমিট্‌মেন্ট বলতেও আমি এই বুঝি।''[৪] আর এখানেই আর এক স্বকীয়তায় নিজেকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে নেন তিনি যাঁকে সমকালীন প্রতিবাদী লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিপরীত কোটির ভাবা যেতেই পারে। তাঁর গল্পে দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক টানাপড়েনে ধ্বস্ত সময়ের অনিবার্য পরিণতিতে উঠে আসা মানুষের 'বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতা' কমলকুমার বা অমিয়ভূষণের মতো তাঁকেও সমকালীনতার স্রোতে এক বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ লেখক গোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করে দেয়।

২

নিজের রাজনৈতিক সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে লোথার লুৎসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একবার বলেছিলেন যে তিনি কখনই involved লেখক নন তিনি রূপকার মাত্র। লেখকের commitment -এর প্রশ্নকেও তিনি আড়াল থেকে দেখেন এবং তাঁর লেখা একটি অপ্রকাশিত গল্প ('কাগজের নৌকা') থেকে এর উত্তর দেন : ''আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত ছিলাম। আমার লেখায় সেই সময়ের কিছু কিছু কথা এসে গেছে। অনেকদিন আগে 'বেতার জগৎ'-এ একটা গল্প লিখেছিলাম 'কাগজের নৌকা'। সেগল্প কোনো সংকলনে স্থান পায়নি এবং তার কপিও আমার কাছে নেই। ...দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকে রক্ত দিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন, শহীদ হয়েছেন। আমি আমার রচনায় তাঁদের সাধারণ মানুষ হিসাবে যে মানসিকতা তাকে ধরার চেষ্টা করেছি। নেতা বা শহীদ হিসাবে নয়।'' ১৯৩২ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তখন তিনি কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। চার মাস তাঁকে কুমিল্লা জেলে থাকতে হয়। জেল থেকে ছাড়া পেলেও একবছর বাড়ীতে অন্তরীণ থাকেন তিনি। এমনকি তাঁর সাহিত্যচর্চার উপরেও নজরদারী রাখা শুরু হয়। 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামে 'সোনার বাংলা' ও 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় কয়েকটি গল্প লেখেন তিনি। 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জার্নালিস্ট' গল্পটি এসময় তাঁর খ্যাতি এনে দেয়। এছাড়াও নবশক্তি, চতুরঙ্গ, দেশ, অমৃতবাজার, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলি ছাপা হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম উপন্যাসেই (সূর্যমুখী, ১৯৫২ সালে রচিত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর ছায়া, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মূল্যবোধের পালাবদলকে দেখতে পাই যা রাজনীতি অনুসঞ্জাত। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের স্বভাবগত লক্ষণ ধরা পড়ে তাঁর 'বারো ঘর এক উঠান' (১৯৫৫) উপন্যাসের শিবনাথ চরিত্রেও। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচৈতন্য, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি সর্বস্বতা, দ্বিধাচিত্ততা, বিকল সংবেদনশীলতা, সৌন্দর্যপিপাসু মনোবিকলন, আপোষ প্রবণতা, সুপ্ত অবদমিত যৌন বাসনা, ক্ষয়িষ্ণু পলায়নপরতা প্রায় সবটাই ছায়া ফেলেছে তাঁর সমকালের গল্প-উপন্যাসে। সেদিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক

চেতনার লক্ষণাক্রান্ত গল্পগুলিও ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিম জীবন প্রণালী, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা মানুষের মনে স্বপ্নভঙ্গ জনিত হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সারসত্তাহীন আত্মকেন্দ্রিক, মূল্যবোধহীন রাজনীতি যা একান্তভাবেই ছিল স্লোগান সর্বস্ব। মূল্যবোধের অবক্ষয়জাত পতন চিহ্নগুলিকে যেমন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সমাজের বুকে তেমনি আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার হীন প্রচেষ্টা এক শ্রেণীর শোষককেই স্পষ্ট করে তুলেছিল। 'মানিকবাবুর মন্ত্রশিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী'[৫] যৌন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর গল্পে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের চাপে বদলে যায় তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্র। ভারতবর্ষের মেট্রোপলিটন সিটি কলকাতার সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী মফঃস্বল গুলিতেও আছড়ে পড়ে সেই তথাকথিত পুঁজিবাদী প্রগতির ঢেউ। আধুনিক সময়ের এই ভাঙনের অভিঘাতকে মার্শাল বারম্যানের ভাষায় বলা যায় : "To be modern is to find ourselves in an environment that promises us adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world and at the same time that threaten to destroy everything we are." দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের এই খুব দ্রুত বদলে যাওয়াকেই দেখতে পাই আমরা এ সময়ে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিতে। পরবর্তীতে ইংরেজের ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম অভিশাপ দেশভাগ ও তার বিষময় ফল, সত্তরের দশকের উগ্র রাজনৈতিক আন্দোলন, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন নিয়েও লিখেছেন বেশ কয়েকটি গল্প।

৩

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা 'কাগজের নৌকা' গল্পটি কোনো গল্প সংকলনে স্থান পায়নি। সেটি লেখা হয় 'বেতার জগতে'। গল্পের বিষয় একটা অ্যাবস্কেন্ডার যুবককে কেন্দ্র করে, যে একরাত্রে আত্মগোপন করে এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেখানে সারারাত ধরে একটি বাচ্চা ছেলেকে সে কাগজের নৌকা, কাগজের পাখি এসব তৈরী করে দেয়। ভোরবেলা উঠে সেই বাচ্চা ছেলেটি দেখতে পায় তার সেই কাকু আর নেই। তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। নিজের সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়ার অভিজ্ঞতা এ গল্পে যেন শিল্পময় রূপ নিয়ে একটি গল্পের অবয়ব গঠন করেছে।

তাঁর লেখা 'বিকালের খেলা' গল্পটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত। বর্ষণক্ষান্ত শ্রাবণের এক চমৎকার বিকেলে ছ'বছরের পিন্টু আর সাত বছরের বাবলু অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে কোনোমতে বেরিয়ে আসতে পেরেছে শহরের রাস্তায়। প্রকাণ্ড একটি ফ্ল্যাটবাড়ীতে থাকে তারা। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখে শহরের রাস্তা। সেই তারা গালিভারের সাহস নিয়ে আজ নেমেছে রাস্তায়। তারা বোঝেনা যে গাড়ির সার চলেছে রাস্তা দিয়ে তার কোনটায় আছে মন্ত্রী, পুলিশ অথবা মাস্তান। ট্রাফিক জ্যামে ভীড়ের মুখে কান পেতে তারা শোনে মিছিলের আওয়াজ। ফেস্টুন উড়ছে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। গ্রিলের

ফাঁক দিয়ে দেখে তারা। বেজায় খুশিতে হাসে হি-হি করে। বাবা-মায়ের ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাবার শাসানিতে তারা আর ভয় পায় না, বলে : 'তোমরা জান না, ছেলেধরাকে আমরা মোটেই কেয়ার করি না। আমাদের ধরতে এলে বোমা মেরে বেটাদের মাথা উড়িয়ে দেব। গাড়ি এসে চাপা দেবার আগেই পেট্রল ঢেলে গাড়ী জ্বালিয়ে দেব।' যমদূতের মতো দুটো চাকর এসে তাদের হাত চেপে ধরে কাঁধে তুলে নেয়। হাত-পা ছুড়ে, আঁচড়ে-কামড়ে, তাদের মাথার চুল ছিঁড়ে গালি-গালাজ করে পিন্টু-বাবলু—'শুয়ার-শালা-কুত্তা'। আবার ব্যালকনি। উঁচু উঁচু গ্রিল। বারান্দা অথবা ছাদ থেকে ভালো করে দেখা যায় না। মিছিলটা থেকে ভেসে আসে দ্রুম্-দাম্ পিলে চমকানো আওয়াজ। চোখের জল মুছে আবার খরগোসের মতো কান খাড়া করে তারা। ক্যালিডোস্কোপের মতো কলকাতার নগরায়ণের ছবি দেখে চলেন জ্যোতিরিন্দ্র। সবুজ মাঠের কিনারে রাজহাঁসের মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সাদা বাড়িটা। ফ্ল্যাটগুলি কোনো কোনোটি থেকে শুনতে পাওয়া যায় ম্যান্ডোলিনের বাজনা, ম্যাকবেথ অবৃত্তি অথবা উঁচুগলায় বাকুনিন পাঠ। কোনো কোনো খুপরিবাসী সপরিবার ডাঁসা পেয়ারা চেবায়—কেউ বা সপরিবার মুক্তাঙ্গনে দেখতে যায় নাটক। পুবদিক জুড়ে আকাশে ভাসে প্রকান্ড রামধনু আর কলকাতার রেডিওতে বাজে দেশাত্মবোধক গান 'আমার সোনার বাংলা'। এরই মাঝে পিন্টু আর বাবলু উঠে যায় ছাদে, জলের ট্যাংকের চারপাশ ঘুরে ঘুরে শুরু করে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' খেলা। তারা বোঝে না কে সাধু আর কে চোর, কে চোরাকারবারী অথবা ভেজালদার। সব থেকে তারা ভালো চেনে বোমার আওয়াজ আর 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। ডানলোপিলোর গদি আঁটা খাট-বিছানা, সোফাসেট আর আলমারী-ওয়ার্ডরোবের জগতে তারা যেন এতকাল আট্‌কা পড়েছিল। সেখানে থেকে তারা পেয়েছিল 'জঙ্গলের স্বাদ' আর 'জঙ্গলের গন্ধ'। ছাদ থেকে দীর্ঘক্ষণ ওদের কিন্তু কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় না। কৌতূহল নিয়ে অবশেষে ছাদে ওঠে ফ্ল্যাটের মানুষজন। রুদ্ধশ্বাসে দেখে ট্যাংকের এপাশটায় রক্তের পুকুরে পিন্টু শুয়ে আছে চিৎ হয়ে যায় আর একটা রুটি কাটা ছুরির অর্ধেকটা ঢুকে আছে তার পেটে। ডাক্তার চ্যাটার্জী তার পেট থেকে ছোরাটা টেনে বের করে নাড়ী পরীক্ষা করে দেখেন সে মৃত। আর তার কাছেই অপরাধীর চেহারা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে তার খেলার সাথী বাবলু—তার বুকের কাছে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা একটি কাগজে কাঁচা হাতে লেখা—'বাবলু পারটি' আর পিন্টুর বুকের কাছেও সেফটিপিন দিয়ে আঁটা অনুরূপ একটি রক্তে মাখা কাগজে লেখা 'পিন্টু পার্টি'। 'পার্টি' বানানটা দু-কাগজে দুরকম।

সত্তরের নকশালপন্থী রাজনীতির সংঘর্ষের করুণ পরিণতি এ গল্পে চিত্রায়িত হয়ে উঠেছে। দুটি অবুঝ শিশু বলি হয়েছে রাজনীতির বিষাক্ত ছোঁয়ায়। তাদের শৈশব কীটদষ্ট। বিদেশে ডাডাইস্টরা অনেকদিন আগে যুদ্ধের ছেলেমানুষি নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু ছেলেমানুষের যুদ্ধ বড়োমানুষদের যুদ্ধ অথবা সংঘর্ষকামী রাজনীতির যে এরূপ বাস্তব ফলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তা পাঠকের ধারণা ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্র এ

গল্পে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটাকে যেন তীব্র শ্লেষের সাথে ব্যবহার করতে চান। এ গল্পের আয়রনিতে কখনও সবুজ মাঠের কিনারে রাজহাঁসের মতো ডানা মেলা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ীটা তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। বাকুনিন পড়ে শোনানোর বর্ণনাটাও ব্যঞ্জনাবহ, যেমন : ''রাষ্ট্রের কোনো নীতির বালাই নেই। চুরি-বাটপাড়ি, ডাকাতি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এমন কোনো দুষ্কর্ম নেই যা রাজনৈতিক ধুরন্ধররা রাষ্ট্রস্বার্থের নামে না করে থাকেন।'' কথাটি সর্বকালে সত্য। চারিদিকের পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনা আর টিবির জার্মের তুলনায় সাদা বিশাল বাড়ীটা কত সুন্দর, যেন তা আমাদের ঠুনকো আভিজাত্য গর্ব আর বাস্তবের ভারতবর্ষকে প্রতীকায়িত করে তোলে। গল্পের শুরুতে 'কলকাতা শহরের নাড়িভুঁড়ি' রূপ গাঁইতি মেরে তুলে ফেলা অ্যাসফল্টের ছালচামড়া অথবা জলকাদাকে দেখে মনে হওয়া 'বদরক্ত' আর প্যাচপেচে মাটি যেন 'মাংসের চাকা' ইত্যাদি শব্দগুলি বিপ্রতীপ রূপে রাজনৈতিক কীটদষ্ট সমাজের দংশন আর পচনকেই চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'কমরেড' গল্পটি দেশ পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯৪২ সালে (৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা ১৩৪৯)। এটিকে তাঁর লেখা প্রথম রাজনীতিকেন্দ্রিক গল্প বলা যেতে পারে। 'ভারতছাড়ো আন্দোলনে'র প্রস্তুতিপর্বে 'কমরেড' গল্পটি বিশেষভাবে তাৎপর্য মন্ডিত।

গল্পটি নামহীন দুটি চরিত্রের। একজন তিপ্পান্ন বছর বয়সী বৃদ্ধ আর অন্যজন দশ বছরের বালিকা। একটি পার্কে তাদের প্রথম আলাপ। ঐটুকু মেয়ের নিয়মানুবর্তিতা আর শৃংখলা দেখে বৃদ্ধ অবাক হয়ে যান। নাম জিজ্ঞাসার সৌজন্যে তাকে 'খুকুমণি' সম্বোধন, করাতে তাৎক্ষণিক জবাব আসে মেয়েটির কাছ থেকে—

—'আমি মাও নই, খুকুমণিও নই।'

—'নিশ্চয়ই না! কি বলে ডাকব বল।'

—'আমি কমরেড।'

একথা বলেই মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এর মধ্যে আবার রাজনীতি কোথায়? আসলে যুদ্ধ করতে গিয়ে ঐ বালিকার বাবা শহীদ হয়েছেন, তাই বালিকার কাছে আর পাঁচটা বাবার থেকে তার বাবা আলাদা। কথায় কথায় একদিন তার বাবার সাথে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য সে বৃদ্ধকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় ও একটি রূপোর ফ্রেমের ব্রোমাইড ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বৃদ্ধ অবাক হয়ে যান। আসলে তার বাবা ছিল বীর সৈনিক। কমরেড। বাবাকে দেখতে দেখতে সে বড়ো হয়েছে। বাবার স্মৃতিই আজ তার বেঁচে থাকার রসদ। তাই সে নিজেকে 'কমরেড' বলে মনে করে। গল্পে 'কমরেড' শব্দটিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই ভাবনাতেই ব্যবহার করেন। 'কমরেড' শব্দটি মূলতঃ মার্কসিস্টদের দ্বারা বহুব্যবহৃত একটি শব্দ। কিন্তু একটি শহীদ ব্যক্তির প্রতি একজন লেখক যখন তাঁর সহমর্মিতা ব্যক্ত করেন তখন তাকে কোনো রাজনৈতিক তক্‌মা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। লাহোর কংগ্রেসের সম্মেলন মঞ্চে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

উপস্থিত জনতাকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেছিলেন কিংবা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বক্তৃতা করতে গিয়ে 'কমরেড' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, কল্লোলের সময়ে যে ফ্রয়েডিজম বহু চর্চিত বিষয় ছিল এবং মানিক ও জ্যোতিরিন্দ্রের লেখায় প্রকট হয়েছিল, সেই আমলেই মার্কসিজম্ ও ফ্রয়েডিজমের দ্বন্দ্বের জন্য লেখক শিবির বিভাজনেরও শিকার হয়েছিল।

'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পটি দীর্ঘ ১৬ বছর পর লেখা ('পরিচয়', অক্টোবর, ১৯৫১)। গল্পের পটভূমি চল্লিশের দশকের অস্থির কাল। খাবারে ভেজাল, যুদ্ধের দামামা, কালোবাজারি, গরীব চাষীর মৃত্যুতে উত্তাল রাজনীতির রোজনামচা। দেশের শত্রু আর মানুষের শত্রুর প্রতিবাদ করতে গিয়ে শহীদ হয় আনন্দ নামের যুবকটি। শহীদ পুত্রের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান তার বৃদ্ধ পিতা। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চান না যে আনন্দ আর বেঁচে নেই। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন আনন্দের বাড়ী ফেরার। চাকর মধুরের মুখে জানা যায় প্রতিবছর ঐ দিনটাতে কর্তামশায় কেমন যেন হয়ে যান। একদিন শিকার বিলাসী দুই যুবক এসে হাজির হয় পার্বতীপুরে আর তাদের সঙ্গে দেখা হয় রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসার আনন্দর পিতার। সাময়িক আতিথ্যের পর তিনি তাদের তাঁর ছেলের সাথে দেখা করে যাবার অনুরোধ করেন। অবশেষে ভিতরের ঘরে টাঙানো এক ব্রোমাইড ফটোর সামনে এনে বৃদ্ধ দাঁড় করান তাদের। ছবিটি আনন্দের এবং বৃদ্ধের মুখে হাসি। ১৯৪২ সাল থেকে ঐ বৃদ্ধ গ্রামের বাড়িতে আছেন ছেলের স্মৃতি বুকে আগলে। বন্দুকধারী দুই যুবক আনন্দর সমবয়সী প্রায়। তাদের প্রশ্ন, যেহেতু আনন্দ পলিটিকস্ করে তাই হয়তো সে গাঁয়ে থাকে না, কলকাতায় থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলেন : 'না তা ঠিক নয়, এখনই আমি পলিটিকস্ করতে দিচ্ছি না যদিও, তবে কমনসেন্স থাকলে, চোখ কান খোলা থাকলে একটি ছেলের যে ধরনের ভাবনা চিন্তা হয় আনন্দরও তাই হচ্ছে—তাই মাঝে মাঝে এসব বলে আমাকে।' আসলে ঐ ব্রোমাইড ফটোর মধ্যবর্তী নীরব আনন্দ তার পিতাকে কিছুই বলে না, যা মনে হয় তা সম্পূর্ণতই এক বৃদ্ধের মনের ট্র্যাজিক এক অনুভব এবং বলা বাহুল্য তাতে মিশে থাকে এক রাজনৈতিক ট্র্যাজেডীর বেদনা ঠিক 'কমরেড' গল্পটির মতোই। নির্জন মাঠের মাঝে পাঁচটি বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে থাকে স্থির। গাছগুলি যেন প্রহরীর মতো তাদের পায়ের নীচে থাকা একটি কাঁচা শহীদ বেদী পাহারা দেয়, যে শহীদ বেদীতে ছড়ানো সাদা জুঁই ফুলের মালা। আনন্দর পিতার কথা অনুযায়ী সত্যিই আমাদের কমনসেন্সের বড়ো অভাব, অন্ততঃ রাজনীতির আবর্তে, অবক্ষয়ের বুকে সমাজটা তলিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যিই যেন আমাদের করার কিছুই নেই।

'তারিণীর বাড়ি বদল' ('পূর্বাশা', বৈশাখ, ১৩৫৭, ইং ১৯৫০) গল্পটির তারিণী নগর কলকাতারই একজন বদলে যাওয়া মানুষ আর হৃদয়ের অনেকটাই অধিকার করে আছে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক, প্রভুত্ব বিলাসী-আয়েসী চেতনা—যে চেতনা তার সুখের উপাদান খুঁজে নিতে চায় ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির যূপকাষ্ঠ থেকে। এ গল্পেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে

অর্থনীতি ও রাজনীতির সংজ্ঞা বদলের চিহ্ন স্পষ্ট। এ গল্পে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারিণী নিজের অস্তিত্ব ও পরিচয় বাঁচিয়ে রাখার ক্রমাগত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়।

'হিমির সাইকেল শেখা' ('জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প' সংকলন, ১৯৯৩, সুব্রত রাহা ও অজয় দাশগুপ্ত সম্পাদিত) গল্পটি সম্ভবতঃ সত্তরের দশকে লেখা। সংলাপ মুখ্য এ গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো এ গল্পে 'গরিবী হটাও' স্লোগানটিকে অন্ততঃ চারবার ব্যবহার করা হয়েছে। সুবিদিত এই যে, স্লোগানটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। স্লোগানটি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যাও একসময় হয়েছে। ইন্দিরাজী দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তথা উন্নতিশীল দেশ গঠনে ব্যাঙ্ক-বীমার মতো আর্থিক সংস্থাগুলির জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। আর এই আর্থিক বৈষম্যকে দূর করার জন্যই আওয়াজ তুলেছিলেন—'গরিবী হটাও'—এর।

'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে শোষিত সমাজের প্রতিনিধি হলো বস্তিবাসী মেয়ে হিমি। বুর্জোয়া প্রতিনিধি হিসাবে বাবলুর মা শোভনা ও তথাকথিত মেকী সাম্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এ গল্পের বাবলুর বাবা জগদীশবাবু।

সমাজ সচেতন শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এ গল্পে বড়লোক ও গরীবের পার্থক্যকে নিপুণভাবে তুলে ধরেন তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা, খাদ্য-খাদ্যাদি নির্বাচন ও পোযাক পরিচ্ছদের তফাতের মধ্যে দিয়ে। ছোট ছোট বাক্যের কাটা কাটা শ্লেযে গল্প রস ঘনীভূত হয়। জগদীশবাবুর তেতলা বাড়ী শোভনা লজের সামনে বস্তিবাসী চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে হিমিকে সাইকেল শেখায় বাবলু আর ব্যালকনির রেলিং-এ ঝুঁকে তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন জগদীশবাবু। হিমি ঘামে, বাবলু ঘামে—ওঠে-পড়ে, আবার সাইকেল চালায়। প্রসাধনরত শোভনা এসব দেখে ক্ষিপ্ত হয়। 'ধুমসি' মেয়ে হিমিটাকে সে বিশ্বাস করে না, তাই রাগে জগদীশের কাছে গিয়ে সাপের মতো হিস্‌হিস্ করে ওঠে। জগদীশের কাছে অবশ্য 'ওরা দুটিতে বন্ধু'। হঠাৎই বাবলু আর হিমি পরস্পর হাত দেখায় বাবলুর মা আর বাবাকে—চেঁচিয়ে ওঠে 'গরিবী হটাও, গরিবী হটাও।' জগদীশ হেসে বলে—"বাবলু রাজনীতি করছে। এই ছেলে লিডার হবে।" বস্তিবাসী হিমি ঠোঙা বানিয়ে সংসার চালায়। জগদীশ হিমিকে নিয়ে বাবলুকে ওপরে তাদের ঘরে উঠে আসতে বলে। অবশেযে বাবলুদের ঘরে এসে দামী চেয়ারে বসে তিনজন। হিমির সন্দেশ, আইসক্রিম কিংবা কোকাকোলা পছন্দ নয় এবং বেশী প্রিয় ডালমুট। হিমিকে দেখে শোভনার অশ্লীল মনে হয় তাই তিনি আগেই বেরিয়ে চলে যান তার বান্ধবীর বাড়ী। বাবলু ডালমুট চিবাতে চিবাতে বলে : 'ভীষণ পাজি আমার মা, বুর্জোয়া।' আর বাবার পক্ষে তার সওয়াল : 'তুমি ভীষণ ভালো বাবা, তুমি গান্ধীর মতন, ছোট বড় ভেদ নেই।' বাবলুর চোখে বাবা ভালো কারণ বাবা হিমিকে ওপরে উঠতে দিয়েছে, তাদের ঘরে বসতে ও ভালো জিনিস খেতে দিয়েছে।

এরপর জগদীশ হিমিকে তার পুরনো ফাউনটেন পেনটা প্রেজেন্ট করতে চায়। কিন্তু তাতে বাবলুর আপত্তি থাকায় সে বাবলুর মার মুর্শিদাবাদি শাড়ী অথবা শোভনার একজোড়া

নাইলনের ব্রেশিয়ার হিমিকে প্রেজেন্ট করার কথা বলে। অবশেষে কফি শেষ করে হিমি আর বাবলু নীচে নেমে যায়। আবার শুরু হয় সাইকেল শেখা। সিগারেট হাতে রেলিং-এ ঝুঁকে, দাঁত ছড়িয়ে হেসে পুনরায় জগদীশ বাবু দেখতে থাকেন হিমির সাইকেল শেখা। স্বল্পবাস ঘর্মাক্ত হিমির উদ্ধত স্থূল উরুর ওঠানামা তাকে যেন ক্রমশঃই প্রলুব্ধ করে।

এ গল্পে বাবলুর বাবা জগদীশের ভাবনায় : 'তার ছেলে মিনিস্টার হবে, বাবলু প্রেসিডেন্ট হবে' আর বাবলুর মায়ের ভাবনায় : 'তোমার ছেলে গুন্ডা হবে, সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে তোমার ছেলে একটা লোফার হবে' আসলে সমাজের মানুষের কাছে গল্পকারের তুলে ধরা এক তীর্যক ব্যঙ্গ। লেখক আদতে বোঝাতে চান এর সবটারই কারণ আসলে হিমি, যাকে সাইকেল চালানো শেখা আসলে বাবলুর মতো বড়লোকদের আভিজাত্যের পক্ষেই বেমানান। অন্যদিকে বাবলুর বাবা জগদীশের লজ্জাহীনের মতো হিমির সাইকেল শেখা দেখার অবদমিত যৌন বাসনায় ভেসে যায় প্রগতিপন্থার বড় বড় কথা। সকলের অগোচরে জগদীশ হিমির ব্যবহৃত রুমাল তুলে ধরে নিজের নাকের কাছে, হিমিকে প্রেজেন্ট করতে চায় অশোভন পরিচ্ছদ। বাবলুর মুখে হিমির জাঙ্গিয়া পরে দড়ির ওপর সাইকেলের খেলা দেখানোর কথায় উল্লসিত হয় জগদীশ। হিমি যখন বলে 'তোর বাবাটা—বোকা—তোর মার জিনিস আমায় দিতে চাইছে।' তখনই শক্ত হাতে হিমির কোমর চেপে ধরে বাবলু বলে ওঠে—'বাবা গ্রেট, বাবা ভালো—গরিবী হটাও, গরিবী হটাও।'

জ্যোতিরিন্দ্র এ গল্পে এক ত্রিবিধ সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে রাজনৈতিক সমীকরণকে নতুন ভাবনায় তুলে ধরতে চান। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস একসময় বলেছিলেন 'শোষণহীন শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ'-এর কথা যার ঠিক বিপরীতে থাকে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যকামী বুর্জোয়াতন্ত্র যার মূল লক্ষ্য হলো শ্রমিককে শোষণ করে অধিক মুনাফা অর্জন অর্থাৎ সাম্যবাদকে ভেঙে ফেলা। সাম্যবাদ ভেঙে যায় জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদের কারণে, আর তখনই গান্ধিজীর 'সর্বোদয়' সমাজ গঠনের চিন্তা, 'ছোট-বড় ভেদ নয়' ভাবনা অথবা 'গরিবী হটাও' স্লোগান—লোক দেখানো এক চরম ফাঁকি বলে মনে হয়। সত্তরের দশকের কংগ্রেসী রাজনীতি সম্পর্কে এক তীব্র ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এ গল্পে। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের দীনতা শুধু ঘোচেনা মিটিং-মিছিল অথবা স্লোগানে বরং তা রাজনীতির মিথ্যে প্রচারকে স্পষ্ট করে তোলে। জগদীশবাবুর মতো দর্শকামী অথবা voyeur ব্যক্তিকে গান্ধিজীর সাথে তুলনা করে সমাজের উচ্চবিত্ত কোটির তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতন মানুষদের উদ্দেশ্যে তিনি যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চান। হাত চিহ্নের সাথে সাথে 'গরিবী হটাও'-এর স্লোগান যেন এক অনাবৃত কদর্যতার ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। স্বভাবসিদ্ধ যৌনতাকে এ গল্পেও গল্পকার মিশিয়ে দিতে চান জগদীশের মনশ্চক্ষে এবং প্রকাশ্যে যৌনক্রিয়ার আভাস লক্ষ্য করার নিষিদ্ধ বাসনায়।

'নতুন জ্যোৎস্না' ('জ্যোৎস্নার খেলা' উপন্যাসের সঙ্গে একই গ্রন্থে মুদ্রিত, ১৯৭৭)

গল্পটি সত্তরের দশকের উগ্রপন্থী রাজনীতি অবলম্বনে লেখা একটি গল্প। এ গল্পের পিনাকী সত্তরের দশকের রাজনীতির এক টার্গেট চরিত্র। কলকাতার তিনকড়ি কবিরাজ লেনের নিম্নবিত্ত কেরানী হরিহরের ছেলে সে। ঘুষ না নিয়ে, চুরি না করে সৎভাবে বেঁচে থাকা হরিহরের জীবনের সম্বল ও আশা তার দুটি ছেলে পিনাকী ও পুলক। ছোটবেলা থেকেই মাতৃহারা পিনাকী লেখাপড়া শিখলো বটে কিন্তু জড়িয়ে পড়লো রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে। একদিন দুপুরবেলায় বাড়ীর সামনে তিনকড়ি কবিরাজ লেনের মুখটায় তাজা বোমা আর গুলির আওয়াজের পর যখন কালো রং-এর পুলিশের গাড়ীটা অদৃশ্য হলো তখনই দেখা গেলো হরিহর দত্তর বড়ো ছেলে পিনাকী পড়ে আছে রাস্তায়। মৃত পিনাকীর শার্ট আর পাজামা রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেছে।

এ গল্পে দেখি পরীক্ষায় গণ টোকাটুকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় স্কুল থেকে পিনাকীর নাম কাটা যায়। প্রতিবাদী পিনাকী মজুতদারের গোলা থেকে চালডাল লুঠ করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নেতৃত্ব দেয়। ছোট ছেলে পুলককে নিয়ে হরিহর আশ্রয় নেয় কলকাতা থেকে দূরে নিউব্যারাকপুরে ভগ্নিপতির বন্ধু অশ্বিনী ভদ্রের ভাড়া দেওয়া টালির বাড়ীতে। হরিহরের দৃষ্টিতে পিনাকী ছিলো তার বখে যাওয়া ছেলে। কিন্তু পুলকের কাছে তার দাদার মৃত্যু একটা মর্মান্তিক আঘাত। পুলক সুধারানীর মেয়ে উমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিন পাশের ভাড়াটে কুলদা গুপ্তকে সুধারানী আর হরিহরের সামনে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সে বক্তৃতা দিতে শোনে : ''বেকার গরীব চাষী মজুরেরা বাঁচবে কি করে, এখন দরকার কিছু সাহসী যুবকের যারা দোকানে দোকানে হানা দেবে, মজুতদার, আড়তদারদের গুদামে চড়াও হয়ে চাল, তেল, ডাল লুঠ করে এনে গরীবদের যোগাতে হবে, তার জন্য অনেক রক্ত ঝরবে, কিন্তু না দিলে, বিপ্লব না করলে কোনো দেশের উন্নতি হয়?'' এই কথাগুলি শুনে পুলক রাগে ফুঁসতে থাকে। তার দাদার কথা মনে হয়। নিঃসন্তান কুলদার বক্তৃতা শুনে কখনো তার হাসি পায় অন্যদিকে দাদা পিনাকীর জন্য বাবার এতটুকু অনুশোচনা নেই দেখে মনে মনে কষ্ট পায় সে। একদিন মেয়েদের স্কুলের সামনে কতকগুলি খারাপ ছেলে অসভ্যতা করছিল দেখে পিনাকী ও তার দুজন বন্ধু তাদের প্রচন্ড মেরেছিল। সেরকমই কটি ছেলে একদিন পুলককে রাতের অন্ধকারে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, উমাকে নিয়ে করে কটূক্তি। উমাকে স্কুলে যাবার নাম করে পরদিন তাদের কাছে পৌঁছে না দিলে তারা পুলককে মেরে ফেলবে বলে শাসায়। তাদের হাতে ঝক্‌ঝক্ করে ছোরা। দুটি মাঝবয়সী লোক পুলককে পরেশ মুদির দোকান লুঠ করার কাজে সাহায্য করতে বলে। পুলক তাতে সম্মত হয়। সে বলে : ''আমি কোনদিন রাজনীতি করি না। পার্টি গড়ছি না, কোনরকম আওয়াজ তুলছি না। মজুতদার আড়তদারদের বড় বাড় বেড়ে গেছে, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাইছি।'' পরেশ মুদির দোকানে দেড়'শ টিন সরষের তেল লুকোনো আছে। তা লুঠ করতে হবে। তাই ঐ লোকগুলি পুলকের হাতে তিনটি তাজা বোমার থলে গুঁজে দেয়। কাজটা না করলে তাকে ছোরা দিয়ে মেরে ফেলারও ভয় দেখায় তারা। পুলকের বেঁচে থাকার রঙিন স্বপ্নগুলো একে একে যেন ধূসর হতে থাকে।

ভোরবেলা উমা পুলকের ঘরে এলে পুলক দরজা বন্ধ করে কালকের ছেলেগুলোর বদ মতলবের কথা উমাকে বলে। ছেলেগুলো এগিয়ে এলে সে বোমা ছুড়বে বলে কাঁপা হাতে বোমাগুলো উমাকে দেখায়। সন্ধ্যেবেলায় এই বোমাগুলো দিয়েই সে মুদির দোকান লুঠ করবে এমন কথাও বলে। উমা তাকে উপহাস করে। মানসিক উদ্বিগ্নতায় হাত ফসকে একটা বোমা ঘরের মেঝেয় পড়ে যায়। বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে। সকলে ছুটে এসে দেখে বিস্ফোরনে অশ্বিনী ভদ্রের ঘরের টালির চাল উড়ে গেছে। তারা পোড়ালাশ দুটি বের করে। সুধারানী হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে জানায় কি কুক্ষণে 'হাড় বদমাস' বুড়ো হরিহরের 'পার্টি' আর 'বোমাবাজি' করা ছেলেটার সাথে সে তার 'ফুটফুটে' মেয়েটাকে মিশতে দিয়েছিল। হরিহর শুধু অসহায় আক্রোশে একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘাস ছেঁড়ে। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, মুখের ভাষা গেছে হারিয়ে।

এ গল্পের নাম 'নতুন জ্যোৎস্না' রূপকে উমাকে রূপায়িত করা হলেও পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়না নকশাল আন্দোলনের অশান্ত সময়ে কোনো নতুন জ্যোৎস্না আসে না পিনাকী বা পুলকদের অশান্ত যৌবনে। সত্তর দশকের নির্মম বাস্তবতার চিত্রটিও এ গল্পে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত।

'নীলফুল' ('উল্টোরথ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৮ শারদীয় সংখ্যা) গল্পটি ড. নিতাই বসুর সম্পাদনায় 'অগ্রন্থিত জ্যোতিরিন্দ্র' (অভিজাত প্রকাশনী) গল্পগ্রন্থে স্থান পায়। এ গল্পের পটভূমি সত্তরের দশক অথবা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বাংলা। মলয়, চন্দন এবং ওদেরই সমবয়সী আরো কয়েকটি তরুণ মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে যায়। সুজলা-সুফলা বাংলার বুকে আম-কাঁঠালের বন আর পাখির ডাকের মাঝেই দু-একবার শোনে কামানের গুম্ গুম্ শব্দ। তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে বাংলাদেশী মানুষকে দিয়ে পাঠায় কয়েক গ্যালন পেট্রল, কয়েক টিন কেরোসিন, কয়েক শিশি গান অয়েল আর কয়েক পেটি পেনিসিলিন। বিনিময়ে নিয়ে আসে লাল-সবুজে আঁকা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা—আর ইছামতীর জল থেকে তুলে আনা এক টুকরো কচুরিপানা। সেই কচুরিপানার বুকে ফুটে আছে ছোট্ট নীল ফুল যার আর এক নাম 'জার্মান ফেনা' (ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধের সময় এ ফুলের আমদানি)। যুদ্ধের ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী কাতারে কাতারে হাজির হয়েছে লবণ হ্রদে। এরকমই ক্ষুধার্ত কিছু শরণার্থীকে তাদের বাড়িতে দেখে মলয়ের মা তাদের 'শিয়ালদার রিফুজি' বলে আখ্যা দেন। তার কাছে 'বাংলাদেশ' আসলে একটা আবেগ মাত্র আসল সত্য হলো এই কান্না, ক্ষুধার হাহাকার। এরই মাঝে আড়াই বছরের হাড় জিরজিরে ছেলে কোলে একটা জীর্ণ প্রায় যুবতী এসে দাঁড়ায় মলয়ের মার কাছে যার দৃষ্টি বালতির নীল ফুল খানার দিকে। এখানেই এক আশ্চর্য চমক। জ্যালজেলে শাড়ী পরা অভাবী যুবতীটির কোনো চাওয়া নেই। তার দেশের বিলের ধারে খান সেনাদের কামানের গোলার সামনে লড়াই করে তীর-ধনুক হাতে গ্রামের আর দশটা জোয়ানের সাথে প্রাণ দিয়েছে খোকার বাবা। রক্তে লাল হয়েছে উত্তরের বিল আর ঘর-বাড়ি, খেত-খামার জ্বলে খাক্ হয়ে গেছে আগুনে। আশ্চর্য ভাবে তার কথায় এখানে হঠাৎই উঠে আসে কামানের

গোলার আগুনে 'বিলের কচুরিপানার বেবাক্ পুইড়া কালা আংরা' হয়ে যাবার কথা। যুবতীটির স্বামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ। 'পোড়া কচুরিপানার বিল' যেন সত্য হয়ে দেখা দেয় মলয়দের বাড়িতে কচুরিপানার বুকে সদ্য ফুটে ওঠা 'নীলফুল'টির চিত্রকল্পে। মর্মান্তিক বেদনার স্মৃতি রোমন্থিত হয় যুবতীটির চোখে ঐ নীলফুলকে ঘিরে। সে জানে পোড়া বিলে কালের গতিতে আবার ফুল ফুটবে। মুক্তিযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে দেশ আবার জেগে উঠবে 'জার্মান ফেনা'। আবার ফিরে আসবে স্বপ্নের সুদিন। শুধু আর ফিরবে তার স্বামী। 'নীলফুল' সেই স্বপ্ন-মোহ-কল্পনা আর আশার অঞ্জন পরিয়ে দেয় শুধু ঐ ছিন্নমূল বধূটির নয় বরং পাঠকের চোখেও। প্রকৃতির বুকে বাতাসে দোল খাওয়া ক্ষুদ্র প্রাণ নীলফুল বেঁচে থাকার এবং বৃহৎ স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা নিয়ে জেগে রয়।

'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্প সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, মে ১৯৮১) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনের শেষ দিকে লেখা এক অসাধারণ গল্প। রক্ত নিয়ে মনুষ্যত্বহীন রাজনীতি ও মৃত্যুর এক বেদনাবহ তাৎপর্য বহন করছে এ গল্পের ওয়াং চরিত্রটি। গল্পগ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে। ১৯৭৮-এর শেষ দিকে গুরুতর অবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্র ভর্তি হন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। আরোগ্য লাভের পর ফিরে এসে লেখেন এ গল্প।' এ গল্পে হাসপাতালের রোগীরা নিদারুণ রক্ত শূন্যতায় ভোগে। এদিকে রক্তের স্টক্ ফুরায়। কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত অপ্রতুল হওয়ায় দুর্মূল্য রক্ত কেনার প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতার মুখে মানুষের অসহায় আত্মপ্রকাশের ছবি দেখতে পাই এ গল্পে। একদিকে মহামায়া প্রেসের কর্মচারী কপর্দক শূন্য, নির্বান্ধব উমাপদ নন্দী আর অন্যদিকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের জুতোর দোকানের অর্থবান চীনা মালিক মিস্টার ওয়াং। স্বার্থপরতা আর মনুষ্যত্বহীন সমাজের ঘৃণ্য আর অসহায় চেহারাটি দেখে শিউরে ওঠে সৎ, আদর্শবাদী ওয়াং সাহেব। যেদিন তাকে রক্ত দেবার ব্যবস্থা পাকা সেদিনই সকালে মৃত্যু হয় তার। আর অন্যদিকে মৃত্যুপথযাত্রী উমাপদকে সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখা দেয় ওয়াং-এর প্রেত। সে তাকে বলে : ''আমি রক্ত চাই না। অল ব্যাড ব্লাড। অল পলিউটেড। —পৃথিবীর সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। বুঝেছ বাবু। দিস ইজ্ এ উইকেড ওয়ার্ল্ড—অল ম্যান করাপটেড্।"

৪

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এ পর্বের গল্পগুলিতে বিপন্ন রাজনীতির বিভ্রান্তি আর বিকৃতির সবচেয়ে বড়ো আর সহজ শিকার হয়েছে শিশুরা। রাজনীতির বিকৃতি শিশুদের মুখের ভাষায় এনেছে যে ভয়ংকর অভিব্যক্তি তার ভবিষ্যৎ অনুমান করতেও আমাদের শিউরে উঠতে হয়। তৎসহ অবুঝ শিশুমনের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের নিষ্করুণ পরিণতিও সূচিত হতে দেখতে পাই এ পর্বের কিছু গল্পে। আলোচিত গল্পগুলির মধ্যে এমনই দুটি গল্প হলো 'বিকালের খেলা' ও 'হিমির সাইকেল শেখা'। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ইষ্টিকুটুম' গল্পটির কথাও মনে পড়ে। শহীদ পিতার জন্য তার মেয়ের অনন্ত প্রতীক্ষা 'কমরেড' গল্পে এবং শহীদ

পুত্রের বাড়ী ফেরার অপেক্ষায় বৃদ্ধ পিতার আবেগ 'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দেয়। তবুও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সর্বাত্মক বিচ্ছিন্নতাবোধে ব্যাপ্ত নন জ্যোতিরিন্দ্র বরং অনেক বেশী ব্যষ্টির অন্ত্যার্থকতার প্রত্যাশী তিনি। যদিও প্রত্যাঘাতের জায়গাটিকে সেভাবে প্রস্তুত হতে দেখিনা কোথাও। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক ডামাডোল নানা আঙ্গিকে প্রায় সম্পূর্ণতঃ চিহ্নিত হয়ে ওঠে তাঁর 'বিকালের খেলা' কিংবা 'নতুন জ্যোৎস্না' গল্প দুটির মধ্যে। দুটি গল্পেই কিশোর-কিশোরীদের অকাল মৃত্যু সমকালীন রাজনৈতিক মূল্যবোধের তলিয়ে যাওয়াকেই প্রত্যক্ষ করায়। 'তারিণীর বাড়ী বদল' গল্পে নাগরিক কলকাতার বুকে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও 'নীলফুল' গল্পে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সমস্যা ও নিম্নবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বাস্তবায়িত হয়।

৫

১৯৭৭ সালের গোড়ার দিকে 'পিলসুজ' পত্রিকার তরফে আয়োজিত একটি প্রশ্নোত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জানিয়েছিলেন : "সোশ্যাল কমিটমেন্ট যদি শিল্পের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে শিল্প সৃষ্টি গৌণ হয়ে ওঠে—এবং শিল্পের সজীবতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।"[৮] এ যেন সেই 'Art for art's sake' নীতির মতো। তিনি মনে করেন কোনো শিল্পীই ধরা বাঁধা নিয়ম ও গন্ডীর মধ্যে আটকে থাকতে পারেন না কারণ স্বাধীনতা তার জরুরী। কোনো আরোপিত নিয়ম শৃংখলা বা বাধ্যবাধকতা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একদিকে শিল্পসৃষ্টির অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক সত্তায় যে অর্থে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেন না অন্যদিকে নিজের সঠিক রাজনৈতিক সত্তার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কোনো স্বআরোপিত প্রয়াসও কখনই তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। অন্ততঃ তাঁর গল্প সে কথাই বলে। তথাকথিত বাম কিংবা ডান, কমিউনিস্ট কিংবা কংগ্রেস উভয় রাজনৈতিক দলেরই ভ্রান্ত নীতিগুলির কঠোর সমালোচক হয়ে উঠতে চেয়েছেন তিনি তাঁর গল্পে। অরাজনৈতিক হয়েও তিনি একজন সার্থক রাজনৈতিক কথাশিল্পী। শেষ জীবনে তিনি ফ্রানৎস্ কাফ্‌কা পড়তেন। সে অর্থে রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কাফ্‌কাধর্মী নিঃসঙ্গতা অথবা নিঃসম্পৃক্ততাও যথার্থ রাজনৈতিক মূল্যায়নের একটা বড় ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে। রাজনৈতিক গল্প সত্তার বিচারে তিনি একজন গভীর রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হওয়া সত্ত্বেও কোনো দলের নন, মতের নন, তিনি মানুষের। জ্যোতিরিন্দ্রের নিজের কথায় : "নিজের রচনার ভালোমন্দ যাচাই করতে শিল্পী যত বেশী বাইরের দিকে তাকাবেন ততো বেশী তাঁকে ঠকতে হবে। ...প্রত্যয়ের হাল শক্ত করে ধরে হাজার রকম মতামতের ঢেউ-এর ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শিল্পীর আর কিছু করার আছে বলে আমি অন্ততঃ মনে করিনা।"[৯] হয়তো সে অর্থে অর্থবান, যশস্বী অথবা খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের দলে তিনি পড়েন না। আর তাই এই নিরপেক্ষতা, নিস্পৃহতা অথবা বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়।

কিন্তু তাঁর এই 'রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা'রই সমালোচনা হয় যখন তিনি সজ্ঞানে বলেন

: 'আমি involved লেখক নই, রূপকার মাত্র'। নিজের সময়ের বাস্তবতাকে তিনি সর্বত্র সমানভাবে আনেন না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়দের মতন বরং আন্দোলন বা প্রতিবাদের পথটাকেও অপ্রস্তুত অথবা অপ্রশস্ত রাখেন। প্রশ্ন জাগে যে মানুষটি সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হন—গল্পে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ কেন অনুচ্চারিত থেকে যায়—কেন ছিন্নমূল মানুষের ভীড় থেকে সরে গিয়ে মধ্যবিত্ততার ঘেরাটোপে আশ্রয় নিতে হয় তাকে? ক্রমান্বয় রাজনীতির অস্থির অগ্নিবলয়ের মধ্যে সতত বিরাজমান থেকে এবং দু-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হাতে তুলে নিয়েও তিনি কেন যৌনতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণার আরশিনগরে থেকে যান বন্দী? তাঁর শৈশব জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে আছে নানা গল্প-কাহিনী[১০] সেই সব অভিজ্ঞতার নির্যাস, ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের একজন মধ্যবিত্ত সাধারণ গ্র্যাজুয়েট যুবকের চোয়াল চাপা পণ নিয়ে নানা জীবন সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে একজন সাহিত্যিক হয়ে ওঠার দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে যে সংগ্রামী মানসিকতা কাজ করে যায় তা যেন ঢেকে যায় তাঁর অন্তর্মুখীন লেখক সত্তার ঘেরাটোপে। অগোচরে থেকে যায় তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা অন্তর্ঘাতী মনোভাব। অথচ রাজনীতির বহুমাত্রিক ভাঙনের প্রত্যক্ষ রূপকার তিনি। রাজনৈতিক অনুভূতিকে তুলে ধরার একটা সন্তর্পণ প্রয়াস থেকেই যায় তাঁর গল্পের মোড়কে মোড়কে। Commitment-এর প্রশ্নে অব্যক্ত অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, মধ্যবিত্তের খোলসে থেকেও সৎ-নিষ্ঠাবান চরিত্রের সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা তাঁর গল্পকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। 'নতুন জ্যোৎস্না'র হরিহর প্রতিবাদী নয়, প্রতিবাদী নয় 'কমরেড' গল্পের মেয়েটি অথবা 'পার্বতীপুরের বিকেল' গল্পের বৃদ্ধ পিতা। তবু তাদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার বেদনা, অবাঞ্ছিত একাকিত্বের অভিমান প্রতিবাদের থেকেও কঠিন এক রাজনৈতিক সত্যের মুখে এনে আমাদের দাঁড় করায়। আর এখানেই সমকালীন রাজনৈতির বহির্মুখীনতার সফল রূপকার না হওয়া সত্ত্বেও অনেকখানি এগিয়ে থাকেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর সম্পর্কে বীতশোক ভট্টাচার্য একবার 'দ্বিধাসমতা' পদোবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। বস্তুতঃই এই দ্বিধাসমতা বা Unity because of contrast or diversity বিষয়টিই দ্বিধা ও সংহতির এক বিপরীত সমহার ঘটিয়ে দেয় জ্যোতিরিন্দ্রের অন্তর্জগতে আর তারই প্রতিফল পড়ে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে।

পরিশেষে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিজের কথায় তাঁর প্রতি আরোপিত এই নেতিসর্বস্ব, অবস্থানগত, সত্য বিভ্রমমূলক সমালোচনার জবাব কি ছিল সে প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। 'কালপুরুষ' পত্রিকার সিদ্ধার্থ দাশগুপ্তকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (এপ্রিল, সেপ্টেম্বর ১৯৮২) তিনি বলেন : "প্রতিবাদ করা বা লড়াইয়ের মনোবৃত্তি নিয়ে যে লেখা তা আমি কোনোদিন করিনি, কারণ আমার মনে হয়েছে ওটা করতে গেলে সব সময়েই একটা আওয়াজ তুলতে হয় যেখানে এক ধরনের পলিটিক্যাল মোটিভ কাজ করে। ...আমি যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে সেটা আমার কথা হত, ওদের কথা নয়। সেটা করলে আমি নিজেকে আরোপ করতাম, সেটা মোটেই শিল্পসঙ্গত নয়।"[১১] জ্যোতিরিন্দ্রের এই উক্তি তাঁর সাহিত্যসত্তার মূল্যায়ণে একটা স্পষ্ট স্বীকারোক্তি মাত্র। একে বিপ্রতীপ ডিসকোর্স

বলে সমালোচনা করলেও জ্যোতিরিন্দ্র সমাজের ক্রাইসিস ফ্রাস্ট্রেশনের উপরেই জোর দেন বেশী। রাজনীতির অন্তরালে থাকা—ক্রমহ্রাসমান মানবিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পরিমাপ করতে চান মানুষের নিম্নগামী মনোবিকলনকে। আর সেইসঙ্গে তাঁর গল্পের উপসংহারে জেগে থাকে এমন এক গভীর ট্র্যাজিক সংবেদন যা সমকালীন রাজনীতি নির্ভর হয়েও চিরকালীন মানবসত্যকেই তুলে ধরে।

তথ্যসূত্র :

১. লোথার লুৎসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার : জনপদ প্রয়াস, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

২. পূর্বোক্ত (তথ্যসূত্র-১)।

৩. সবুজ মানুষের জন্ম : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প, তপোব্রত ঘোষ, (ভাঙা কাচের শিল্প)।

৪. কালপ্রতিমার পক্ষ থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকার, 'অনুষ্টুপ', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয় ২০০৯।

৫. 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধ, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬. Mareshal Berman : All that is solid melts into air : The Experience of Modernity, London Verso. 1982, Page 15.

৭. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শচীন দাশ, প্রমা চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮২, পৃ. ১১৬।

৮. 'পিলসুজ', তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৩, পৃ. ২, সম্পাদনা-অমিত রায়।

৯. 'আমার সাহিত্যজীবন, আমার উপন্যাস'—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২, পৃ. ১০৮।

১০. সাক্ষাৎকার, অনুষ্টুপ, প্রাক্ শারদীয় ২০০৯, পৃ. ২৭১।

১১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা : অনুষ্টুপ প্রাক্ শারদীয় ২০০৯।

গ্রন্থঋণ :

১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প—ড. নিতাই বসু সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮

২. 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্প'—প্রসূন ঘোষ, জনপদ প্রয়াস, জানুয়ারী, ২০০৪।

৩. অনুষ্টুপ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয় ২০০৯।

৪. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক পরিচিতি :

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা জে.এন.এম.এস. মহাবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)। বর্তমানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত, খিদিরপুর কলেজ। কলকাতা।